সুমিতকুমার বড়ুয়া

রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনার আলোকে 'অচলায়তন'

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' (১৮৮২) গ্রন্থে 'দিব্যাবদানমালা'র পঞ্চকের কাহিনি পুনঃকথিত হয়েছে। কাহিনিটি এইরূপ: এক ব্রাহ্মণের অনেকগুলি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মারা যাওয়ায় পরবর্তী সন্তান জন্মের সময়ে এক বৃদ্ধা প্রসূতিকে প্রসব করিয়ে পুত্রসন্তানটিকে কোলে করে তার মুখে মাখন ভরে, তাকে সাদা কাপড়ে জড়িয়ে একটি দাসীকে দিয়ে বলেন, একে নিয়ে রাজপথের সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে থাক, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ দেখলেই বলবে, 'শিশুটি আপনাকে প্রণাম করছে', সূর্যাস্তে তাকে ফিরিয়ে আনবে। এই কৌশলে জীবিত শিশুটির নাম মহাপঞ্চক। পরবর্তী পুত্রসন্তান জন্মালে তাকেও একই পদ্ধতিতে বাঁচানো হয়। তার নাম পঞ্চক। ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর মহাপঞ্চক সন্ন্যাস নিয়ে অর্হত্ত্ব অর্জন করে। অন্যদিকে নির্বোধ যুবক পঞ্চক শিক্ষার্জনে ব্যর্থ হয়। দাদা তাকে বিহার থেকে তাড়িয়ে দিলে সে পথের ধারে বসে কাঁদতে থাকে। সম্যকসম্বুদ্ধের নির্দেশে একজন শ্রাবক তার শিক্ষার দায়িত্ব নেয়। কিছুকাল পরে পঞ্চকও অর্হত্ত্ব অর্জন করে।

রবীন্দ্রনাথ এই বৌদ্ধকাহিনিকে প্রতিগ্রহণ করে লিখলেন 'অচলায়তন'। (২ অগস্ট, ১৯১২, গ্রন্থপ্রকাশ)। এডোয়ার্ড টমসন 'Rabindranath Tagore/Poet and Dramatist' গ্রন্থে এই নাটকের ভিন্ন উৎস অনুমান করেছিলেন, "The play's [Achalayatan] teaching reflects many schools of religious thought. It obviously owes something to christianity, perhaps more than any other book of his...Its fable was probably suggested by the Princes, and more remotely, The Castle of Indolence and The Faerie Queen." টমসনের এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ ৩ আষাঢ়, ১৩৩৪-এ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লেখেন, "Castle of Indolence এবং Faery Queen আমি পড়ি নি— Princess-এর সঙ্গে অচলায়তনের সুদূরতম সাদৃশ্য আছে বলে আমার বোধ হয় না। আমাদের নিজেদের দেশে মঠমন্দিরের অভাব নেই—আকৃতি ও প্রকৃতিতে অচলায়তনের সঙ্গে তাদেরই মিল আছে।" (চিঠিপত্র ১২)। অচলায়তনের দুর্ভেদ্য প্রাচীরময় শিক্ষায়তন নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধবিহারের স্মৃতিবাহী নাটককারের মধ্যে অবক্ষয়ী তন্ত্র প্রভাবিত বৌদ্ধসংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারণা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৩১৮ র আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'

তে নাটকটি প্রকাশের পর কার্তিক মাসে 'আর্যাবর্ত' পত্রিকায় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর সমালোচনা লেখেন। তিনি রাজনীতি ও ধর্মের দিক থেকে এর বিচার করেছিলেন। সমালোচককে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি 'আর্যাবর্ত' এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এই পত্রিকা সংখ্যাতেই ললিতকুমারের বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'অচলায়তন'-এর প্রসঙ্গ টেনে বলেন,

> "...বাস্তবিক পঞ্চককে বালক রবীন্দ্রনাথ বলিয়া মনে হয়। ...আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে 'অচলায়তনের' পরেই রবিবাবুর 'জীবনস্মৃতি'তে "ভৃত্যরাজক-তন্ত্র" বাহির হইয়াছে। পঞ্চককে বালক রবীন্দ্রনাথ বলিতে গিয়াই আমার মনে হইল, এই ভৃত্যরাজকতন্ত্রই কি তবে অচলায়তন? তবে কি রবিবাবু আপনার জীবনস্মৃতি রূপকে ও স্বরূপে দুই ভাবেই লিখিতেছেন?"

ললিতকুমার 'অচলায়তন'-কে আর্ট হিসাবে দোষযুক্ত নাটক 'যেন অত্যন্ত diffuse', 'compactness' হীন বলেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে নাটকটিকে 'একরূপ বিকৃত হিন্দুয়ানির উপর নপুংসকের নৃত্য ও লাঞ্ছনা' বলেছেন। অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ ললিতকুমারকে ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮য় আরেকটি চিঠি লিখে নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। যদিও অক্ষয়কুমারের সমালোচনার মূল সুর অসূয়া, তবুও রবীন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে নাটকের চরিত্র পঞ্চকের স্বরূপত অদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তা ভাববার বটে।

২

'দিব্যাবদানমালা'র পঞ্চকের গল্প থেকে মহাপঞ্চকের পাণ্ডিত্য আর পঞ্চকের মূর্খতার বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে বৌদ্ধবিহারের পরিবেশ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আর কিছু গ্রহণ করেননি। মরীচি, মহামরীচি, পর্ণশবরী, একজটা, মহাময়ূরী ইত্যাদি দেবতা ও বজ্রশুদ্ধিব্রত, মহাতামস, সাধন ইত্যাদি মন্ত্রক্রিয়া পদ্ধতি আর বিভিন্ন স্থাননাম রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। নৈবেদ্যর দুটি কবিতার মধ্যে অচলায়তনের ভাববীজ আমরা লক্ষ করব। অনর্থক আচারসর্বস্ব ধর্মের নিন্দা করে কবি লিখেছেন—

> "কর্মেরে করেছে পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
> জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে,
> আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
> করেছে সংকীর্ণ রুধি দ্বার-বাতায়ন—"
>
> (নৈবেদ্য-৫২)

'তুচ্ছ আকারের মরু বালুরাশি' যেখানে 'বিচারের স্রোতঃপথ' গ্রাস করে নি, সেইরকম মানসলোকের সন্ধান করেছেন কবি (নৈবেদ্য-৭২)। মুখ্যত শান্তিনিকেতন ভাষণমালায় এই ভাবনাগুলি নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 'অচলায়তন'-এর ভাবপটভূমি হিসাবে 'সামঞ্জস্য', 'কর্মযোগ', 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করা যায়। কোনো ধর্মকে

আঘাত করে নয়, কবি সত্যসন্ধানের উদ্দেশ্যে ধর্মাচার ও মন্ত্রকে আক্রমণ করেছেন।

৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮য় অমল হোমকে লেখা চিঠিতে 'অচলায়তন' কেন্দ্রিক সমকালীন উত্তাপ উঠে এসেছে। রবীন্দ্র কৈফিয়ৎ,

> "ভারতের ধর্মসাধনাকে ছোটো করবার জন্য শোণপাংশুদের বড় করা হয়েছে একথা ভুল। ধর্মের নামে, সমাজের নামে, আচারের নামে যে বিরাট কারাগার আমরা আমাদের চারপাশে গড়ে তুলেছি সেই বন্দীশালা থেকে, আমাদের সংস্কারকে, অভ্যাসকে, যুক্তিকে মুক্তি দেবার আহ্বানই অচলায়তনের আহ্বান।"

জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করে আচার আপনি বড়ো হয়ে ওঠে সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করে দেয়, এটা 'বিশ্বজনীন সত্য'। সেই 'রুদ্ধ চিত্তের বেদনাই কাব্যের বিষয়'। সকল ধর্মসমাজেই এমন অনেক পুরাতন প্রথা সঞ্চিত হতে থাকে যার ভিতর থেকে প্রাণ সরে গেছে। অভ্যাস বশত মানুষ তাকে প্রাণের সামগ্রী বলে আঁকড়ে থাকে। একদিন সে মোহও ভেঙে যায়। আচার ধর্ম নয়, বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নয়, তা বন্ধন। রবীন্দ্রনাথ 'মন্ত্রের সার্থকতা' বিষয়ে নিঃসন্দেহ,

> "মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র।"

কিন্তু তা মনন চ্যুত হয়ে উদ্দেশ্যকে অভিভূত করে নিজে চরম পদ অধিকার করতে চায়, তখন তার মতো মননের বাধা আর কী হতে পারে। (ললিতকুমারকে লেখা চিঠি, 'আর্যাবত, অগ্রহায়ণে প্রকাশিত)। তিনি তাই অধ্যাত্মসাধনায় মন্ত্রকে স্থান দিতে নারাজ,

> "অধ্যাত্মসাধনায় মন্ত্রের স্থান আমি কোনদিনই স্বীকার করিনি—আমার পিতৃদেবের ও পরিবারের দীক্ষা ও শিক্ষা উপনিষদের মন্ত্রেই কিন্তু সে মন্ত্র যখনই নিরর্থক আবৃত্তিচক্রে তার নিহিতার্থ লুপ্ত করে দেয় তখন সে মুক্তির নামে বন্ধনই করে সৃষ্টি।" (অমল হোমকে লেখা চিঠি, ৭ অগ্রহায়ণ, ১৩১৮)।

এই কথাগুলি শিক্ষা সম্পর্কে সমান প্রযোজ্য।

আমরা মনে করি, 'অচলায়তন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়ে একটি শিক্ষা সমালোচনা করেছেন। 'শিক্ষাবিধি' (৩১ শ্রাবণ, ১৩১৯) প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

> "মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে,...প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না—...তখনি সে মাস্টারমশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীবদেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। ...বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায়...গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। ...আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে

খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; ...চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন।"

'অচলায়তন' নাটকে এমন গুরুরই অনুসন্ধানে ফিরেছেন নাটককার। 'শিক্ষার বাহন' (১৩২২) প্রবন্ধে শিক্ষার 'কায়দা'র প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিদ্রূপ ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে দেশজ শিক্ষার দ্বারা স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত হবার কথা ভেবেছেন তা তাঁর 'শিক্ষার বাহন', 'শিক্ষার হেরফের', 'শিক্ষাবিধি', 'শিক্ষারম্ভ', 'শিক্ষা-সংস্কার', 'শিক্ষা সমস্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধে ধরা পড়েছে। তিনি প্রচলিত পুঁথিসর্বস্ব যান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প পথ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর শিক্ষাভাবনার কিছু কার্যকরী দিক তুলে ধরা প্রয়োজন। ১৮৯১ এর ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মোপাসনার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। ১৮৮১র মার্চের ট্রাস্টডীড উল্লিখিত রয়েছে, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেন। ১৮৯৯-এর অগস্টে তাঁর মৃত্যু হয়। এই বছরই পৌষ উৎসবের দিন 'ব্রাহ্মধর্মশিক্ষা এবং প্রচারের জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১ এর ২২ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। আশ্রম বিদ্যালয়ে ছাত্রদের গায়ত্রী শেখানো, প্রত্যহ পাঠারম্ভের আগে 'ওঁ পিতা নোহসি' মন্ত্র বলা, বিলাসিতাহীন কঠোর সংযত জীবনের দীক্ষা, সেইসঙ্গে ইংরাজী, বিজ্ঞান, এন্ট্রাস পরীক্ষা প্রস্তুতি ইত্যাদিও করানো হত। তবুও আশ্রম চত্বরে দুটি ভিন্নমুখী শিক্ষাব্যবস্থার সংস্রব এড়ানো সম্পূর্ণভাবে সম্ভব ছিল না। আশ্রম বিদ্যালয়কে ব্রহ্মবিদ্যালয় থেকে দূরেই তিনি রাখতে চেয়েছিলেন—'শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংস্রব প্রার্থনীয় নয়' (কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা চিঠি, ১৩ নভেম্বর ১৯০২)। তবুও প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবন কেন্দ্রিক আর্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি আগ্রহী ছিলেন। আশ্রম বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্ময় অনুভব করে তিনি লিখেছিলেন, "সমস্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া বিদ্যালয় নবতর প্রাণ ও প্রবলতার প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।" (মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩)। ১৩ নভেম্বর ১৯০২-এ কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা দীর্ঘ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয় সংক্রান্ত শিক্ষাভাবনা ফুটে উঠেছে,

> "...বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ...সংযমের দ্বারা ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা শুচিতা দ্বারা একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্যব্রত।...ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান করিতে চাই ...ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোনো মতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। ...ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। ...বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন

আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে। যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনো প্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহার স্থানে হিন্দু আচারবিরুদ্ধ কোন অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না। ...গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। ...এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। ...অধ্যাপকগণ, আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন। তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই প্রাচীন ভারতবর্ষীয় শিক্ষাপ্রীতি কার্যক্ষেত্রে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল। তিনি নিজে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা (৫ ডিসেম্বর ১৯০২) চিঠিতে আশ্রমের আচার্য রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়। সর্বাপেক্ষা ভাল হয় যদি কুঞ্জবাবুকে নিয়মিত অধ্যাপনার কার্য হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। তিনি যদি আহারাদির তত্ত্বাবধানেই বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকেন তবে ছাত্রদের সহিত তাঁহার গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকে না। ব্রাহ্মণেতর ছাত্রেরা কি অব্রাহ্মণ গুরুর পাদস্পর্শ করিতে পারে না?"

ধর্মের মোহে রবীন্দ্রনাথের মনও কী সাংঘাতিক নিয়মসর্বস্ব হয়ে উঠেছিল এই চিঠিটি তার দলিলস্বরূপ। এই রবীন্দ্রনাথই পরবর্তীকালে নিয়মসর্বস্বতার বিরুদ্ধে সহজ প্রাণের স্বভাবকে তুলে ধরে মুক্ত শিক্ষা প্রসারের কথা বলবেন! আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপর্বে রবীন্দ্রনাথ কম অবিচারের সাক্ষী হননি। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপকদের অগ্রগণ্য ক্যাথলিক খ্রিস্টান ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও তাঁর সহযোগী রেবা চাঁদের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। কার্যত তাঁদের কার্যত্যাগ করতে বাধ্য করানো হয়। অবশ্য দেশ-কালের বিচারে তখন রবীন্দ্রনাথও নানাভাবেই সংক্ষুব্ধ ছিলেন। বিংশ শতকের প্রথমার্ধ রবীন্দ্রজীবন ঘটনাবহুল। স্বদেশী রাজনীতির উত্তাপে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিতে যোগদান ও ব্যর্থ হওয়া, পারিবারিক জীবনে একের পর এক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি চলছিলেন। এর পাশাপাশিও যে তিনি শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও কর্মযজ্ঞ করে চলেছিলেন এ কী বড় কম কথা!

ব্রহ্মবিদ্যালয় ও আশ্রম বিদ্যালয়ের নিয়মের নিগড় যতই শক্ত হয়েছে, মুক্তমনা রবীন্দ্রনাথের চিত্ত এতই হাসফাঁস করে উঠেছে, সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলের বেড়াজালকে ভেঙে তিনি বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। আবার এদেশের আধ্যাত্মিকতার চোরা স্রোত শিক্ষাক্ষেত্রে ঢুকে যাতে বিপর্যয় ডেকে না আনে তার জন্য তিনি আবার নিয়ম শৃঙ্খলাকেই স্বাগত জানিয়েছেন। চিন্তক আর কর্মীর মনোসংঘাতের ইতিহাসের সরণী বেয়েই 'অচলায়তন' লেখার প্রস্তুতি চলছিল। 'অচলায়তন' ভাঙার আন্তরিক তাগিদ ও মনে মনে অনিবার্যভাবে ঘনিয়ে উঠছিল। চিঠিপত্রে এই সংঘাত চমৎকার ফুটে উঠেছে। 'অচলায়তন' প্রকাশের আগের বছর ৩০ কার্তিক ১৩১৭য় রবীন্দ্রনাথ আশ্রম অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন,

> "আগামী সেশনের জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা ও নিয়ম করবার আছে—আবার কবির আসন ছেড়ে কাজের ক্ষেত্রে নামতে হবে।"

বিদ্যালয়ের নিয়মনিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দিয়ে ১২ অগ্রহায়ণে লেখা চিঠিতে কবি আবার জানান,

> "আমাদের বিদ্যালয়ে যদি শৃঙ্খলাবিধান ব্যবস্থার কঠোরতার দিকে দৃষ্টি রাখি তবেই এ দেশে আধ্যাত্মিকতা অতি সহজেই যে উদ্দাম বিকৃতির মধ্যে গিয়ে পড়ে তার থেকে রক্ষা হবার উপায় হবে।"

রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন, এইসময় ক্রমবর্ধমান ছাত্র ও শিক্ষক বৃদ্ধিতে আশ্রমবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। রবীন্দ্র নির্দেশে বিদ্যালয় পরিচালনের জন্য নানাবিধ নিয়ম নিষেধ, অপিস-পত্তন, নানাপ্রকার রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক কৃত্যসূচক ঘন্টাধ্বনির সংকেতাবলি প্রচলন করেন। আদ্য-মধ্য-শিশু বিভাগের অধ্যক্ষ ও সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচন প্রথা, ছাত্রদের পালনীয় কর্তব্য 'সূচি ও ছাত্রশাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়। নানা বৈপরীত্যের সহাবস্থান সন্নিবিষ্ট রবীন্দ্রমানসের পক্ষে এই একবগ্গা নিয়মানুগত্য দেখানো সত্যিই সম্ভব নয়। তিনি পরিস্থিতির চাপে অনেক সময় নিয়মানুগত্য দেখালেও তাঁর মুক্ত কবিসত্তা তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। আমাদের ধারণা, এই আশ্রম বিদ্যালয়ের নির্মাণ পর্বে রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রথা, নিয়মজাল চালু করতে সোৎসাহ সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু কয়েকবছর যেতে না যেতেই নিয়মাবলির আধিপত্যে ক্রমশ আত্মপীড়ন অনুভব করেন। সেই 'বেদনা' 'অচলয়ায়তন'-এ আভাষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আচার্য অদীনপুণ্যর উপলব্ধি উদ্ধারযোগ্য,

> "...এই অতিদীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করছে—কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছে।"

অচলায়তনের আচার সর্বস্বতার অন্তহীন পুনরাবৃত্তির ক্লান্তিকর গ্লানির এই উপলব্ধি কি একা আচার্য অদীনপুণ্যের, শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের আচার্য রবীন্দ্রনাথেরও কি নয়?

এইসময় আশ্রমের অভ্যস্ত পরিবেষ্টনের বাইরে দূরে বিদেশে গিয়ে সময়যাপনের

জন্য কবি অস্থির হয়ে ওঠেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র (চৈত্র সংখ্যা) 'আশ্রম-কথা'র লেখক সম্ভবত অজিতকুমার চক্রবর্তী। তিনি কবিমনের এই সংক্ষুব্ধ, দ্বিধাচঞ্চল মনের পরিচয় দিয়ে লেখেন,

> "তাঁহার যাত্রার পূর্বে তিনি নানা উপলক্ষ্যে আমাদিগকে কেবলি বলিয়াছেন যে, তিনি সেই সমস্ত বিশ্বের একটি হাওয়া আমাদের এই আশ্রমের মধ্যে বহাইতে চান। আমরা এই একটুখানি জায়গার মধ্যে আছি, এবং পঠনপাঠন করিতেছি, এ সংস্কারটাকে দুর করিয়া ইহাই আমাদের দ্বারা সর্বদা অনুভব করাইতে চান যে আমরা বিশ্বে আছি—যেখানে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে একটা চিন্তাশক্তি অহরহ অদ্ভুত সৃজনকাজে নিযুক্ত হইয়া আছে। সেই বিচিত্র জ্ঞানকর্ম্ম প্রেমের সৃজনের বিরাট ক্ষেত্রে আমরা আছি, সেইখানে কাজ করিতেছি, সেইখানে ভাবিতেছি, সেইখানে জ্ঞানলাভ করিতেছি—এই চেতনাটা যাহাতে বড় হয়—কেবল কতকগুলি বাহিরের শুষ্ক বিধিবিধান মানিয়া চলিবার অভ্যাস যাহাতে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া না বসে, তদ্বিষয়ে তিনি যাইবার পূর্ব্বে বারম্বার আমাদিগকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন।"

'অচলায়তন'-এ কবির এই ভাবনাগুলি সংহত রূপ পেয়েছে বলে মনে হয়। এই নাটকে গুরু, দাদাঠাকুর আর গোঁসাই একই ব্যক্তি, কাজের ফেরে তাঁর এই ত্রিধাবিন্যস্ত রূপ। তবে এই নাটকে গুরুর ভূমিকাই মুখ্যত প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি রবীন্দ্রের আদর্শায়িত মনের ঘনীভূত রূপ। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের বহুধাবিচিত্র মনের নানাখানা ভাব তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির আশ্রয়ালম্বন ও বিষয়ালম্বন। আগেই বলা হয়েছে যে অচলায়তনের আচার্যের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ মনের সঙ্গে আশ্রম বিদ্যালয়ের আচার্য রবীন্দ্রনাথের ভাবনার একটা সূত্র রয়েছে। তাঁর মধ্যে নানা বৈপরীত্য, একদিকে তিনি মহাপঞ্চকের নিঃশঙ্ক সংকীর্ণ নিষ্ঠাকে ঈর্ষা করেন, অন্যদিকে পঞ্চকের অকুতোভয় উদ্দামতাকে সর্বান্তকরণে কামনা করেন। তিনি আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে নিজের অক্ষমতা বুঝতে পারেন, কিন্তু তা ঢেকে রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। শিক্ষকের এই মহৎ গুণের অধিকারী এই আচার্য তাঁর গুরুর আগমন প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মচারীদের কাছে তাঁর সহজ স্বীকারোক্তি,

> "জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণিকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।"

৩

'অচলায়তন' নাটকে কী প্রকৃতিতে, কী জীবনে, সর্বক্ষেত্রেই বৈপরীত্যের আশ্চর্য বুনন—'নিষ্ঠা' ও 'নিষ্ক্রমণ'-এর টানাপোড়েন দেখা যায়। মহাপঞ্চক যেন শুষ্কতা ও শক্তিমত্তার মূর্তিমান গ্রীষ্ম। অন্যদিকে পঞ্চক যেন অচলায়তনের মধ্যে কোমলতা ও সরসতার

নববর্ষার দূত। এই দুই অসেতুসাধ্য বৈপরীত্যকে সেতুসাধ্য গড়ে তোলার কঠিন ব্রত গুরুর।

'পৃথিবীর কত দিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি—অরণ্যের কত রাতের স্বপ্ন-দেখা বৃষ্টি' অবশেষে এসেছে। কিন্তু এই বহুপ্রতীক্ষিত বর্ষার জন্য কম মূল্য দিতে হয়নি। অজানাকে জানবার উদগ্র আগ্রহ থাকার অপরাধে বালক সুভদ্রকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করার আসনে বসতে হয়েছে। আর যেটি আরো গুরুতর—চণ্ডক নামে শোনপাংশু যুবককে তপস্যা করবার অপরাধে অচলায়তনের রাজা মন্থর গুপ্ত তার প্রাণ নেন, তখনি বর্ষা নামে। 'সকলের পায়ের নিচেকার মাটি' পাওয়া গেল। শিক্ষাক্ষেত্রের নিয়মসর্বস্বতার একঘেয়েমির পৌনঃপুনিকতার বিরুদ্ধে কি এভাবেই প্রতিবাদ ঘনিয়ে ওঠে না?

'অচলায়তন' ত্রিধাবিন্যস্ত—অচলায়তনিকদের শোনপাংশুদের আর দর্ভকদের। আবার স্বরূপত তারা কোথাও একও বটে। তবুও নাট্যবেদনা সঞ্চার ও নাটকের একৈকাভিমুখিতা রক্ষার্থে অচলায়তনিকদের অচলায়তনটাই বেশি গুরুত্বময় হয়ে উঠেছে। ত্রিধাবিন্যস্ত অচলায়তন গুলির শিক্ষা-সাধন মার্গ, আচার্য, মহাপঞ্চকদের জ্ঞান, শোনপাংশুদের কর্ম আর দর্ভকদলের ভক্তিমার্গ। এই তিনটি মার্গ তাদের পথকেই একমাত্র প্রার্থিত পথ বলে মনে করে, তাদের মানসিক সংকীর্ণতা অন্য মত-পথ কে মেনে নিতে নারাজ। এদের এই অসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ডৌল দেবার জন্য দাদামশাই বা গোঁসাই বা গুরুর প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

আনন্দবর্জিত যে শুষ্ক জ্ঞান তা মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের অন্তরায়। 'The Center of Indian Culture' (1919) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "Education can only become natural and wholesome when it is the direct fruit of a living and growing knowledge." যেখানে শিক্ষা সুস্থ যাপন আর বিকাশশীল জ্ঞানকে সাঙ্গীকৃত করে নিতে পারে না, সেখানে সহজ আর স্বাভাবিক থাকে না, তা প্রাণহীণ হয়ে পড়ে। আলোচ্য নাটকের একটি দৃষ্টান্ত—

"জয়োত্তম। আমার তো উনিশ বছর বয়স হল—এর মধ্যে একবারও আমাদের গুরু এ আয়তনে আসেন নি। আজ তিনি হঠাৎ আসতে যাবেন এটা বিশ্বাস করতে পারি নে।

সঞ্জীব। তোমার তর্কটা কেমনতরো হল হে জয়োত্তম? উনিশ বছর আসেন নি বলে বিশ বছরে আসাটা অসম্ভব হল কোন্ যুক্তিতে?

বিশ্বম্ভর। তা হলে অঙ্কশাস্ত্রটাই অপ্রমাণ হয়ে যায়। তবে তো উনিশ পর্যন্ত বিশ নেই বলে উনিশের পরেও বিশ থাকতে পারে না।

সঞ্জীব। শুধু অঙ্ক কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাও টেঁকে না। কারণ, যা এ মুহূর্তে ঘটে নি তা কিছুতেই পরে ঘটতে পারে না। আচ্ছা, এসো, কিছু যে ঘটে সেইটে প্রমাণ করে দাও।

পঞ্চক। (জয়োত্তমের কাঁধে চড়িয়া) প্রমাণ? এই দেখো প্রমাণ। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। আঃ পঞ্চক! কর কী! নাবো বলছি—আঃ নাবো।

পঞ্চক। আমি যে তোমার কাঁধে চড়েছি সেটা প্রমাণ না করে দিলে আমি কিছুতেই

নামছি নে। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—।"

তবে শুষ্ক জ্ঞানার্জন কখনো কখনো শাপে বর হয়েছে। মহাপঞ্চক তার পৌরুষ দিয়ে একা অচলায়তনকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। তখনও কী পরম নিষ্ঠায় মহাপঞ্চক নিজ কর্তব্যকর্মে অবিচলিত থাকবার স্পর্ধা দেখিয়েছে। তার সংকল্প দৃঢ় ঘোষণা,

> "পাথরের প্রাচীরে তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে বললুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের আলো, লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে পারে না।"

এই সংকীর্ণ অথচ শ্রদ্ধার্হ নিষ্ঠাকে ঠিক পথে চালিয়ে দেবেন গুরু। অন্যদিকে পঞ্চক যুক্তি ছাড়া কিছুতেই মানবে না যে মহাময়ূরী দেবীর পূজাচারে সে নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। লঙ্ঘনের নিয়মানুসারে তিনদিনের মাথায় দেবীর ক্রোধে সাপে কাটবার কথা, আদৌ সাপে কাটে কি না সে তাও বুঝে নিতে চেয়েছে। এই প্রবণতা কোথাও তাকে মজারু করে তুলেছে। অনেকটা অসচেতনভাবে উত্তরদিকের জানলা খুলে ফেলেছিল সুভদ্র। পঞ্চক সচেতনভাবে জানার কৌতুহলে উত্তরদিকের জানলা খুলে 'ভয়ানক পাপ' করতে চায়। মহাপঞ্চকের কথামত এ করলে নাকি 'মাতৃহত্যার পাপ' হয়। পঞ্চকের তাতেও কৌতুহল,

> "মাতৃহত্যা করলুম না অথচ মাতৃহত্যার পাপটা করলুম, সেই মজাটা কিরকম দেখতে আমার ভয়ানক কৌতুহল।"

তার কাছে প্রায়শ্চিত্ত নতুনকে জানারই নামান্তর,

> "প্রায়শিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিকতেই পারত না।"

আচার্যেরও একদিন পঞ্চকের মত সজীব মন ছিল, মাঝে মাঝে তার আভাস পেলেও এখন নাগাল পান না। তিনি স্মৃতি হাতড়ে বলেন, "...বহুপূর্বে সব-প্রথমে সেই ভোরের বেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে যাঁর কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেছিলুম তিনি গুরুই—তিনি পুঁথি নন, শাস্ত্র নন, বৃত্তি নন, তিনি গুরু।" কিন্তু অহোরাত্র তিনি নিয়মের গিঁটে বাঁধা পড়ে গেছেন, কিন্তু অনিয়মের প্রতি ভিতরে ভিতরে দুর্নিবার আগ্রহও জমে উঠেছে। পঞ্চকের মধ্যেই তিনি তাঁর মুক্তিকে খুঁজে পান, ভয়ানক পাপকারী সুভদ্রকে আগলে রাখতে চান। পঞ্চকের বন্ধনহীন যাত্রার তিনি মানসসঙ্গী, উৎসাহদাতাও বটে। তাঁর জীবনলব্ধ উপলব্ধি শিক্ষাজাত সত্যলাভের প্রতি ধাবিত হয়েছে। পঞ্চককে বলেছেন,

> "এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও।"

শোনপাংশুর দল কর্মমার্গী। তারা অন্তরের মুক্তি প্রত্যাশী নয়, চায় বাইরের কাজ করার অগাধ অধিকার। তারা দিবারাত্র বাইরে পাক দিচ্ছে, তাই 'বাইরেটাকে দেখতেই পায় না'।

অচলায়তনিকদের যেমন শাস্তিভঙ্গের প্রয়োজন এদের প্রয়োজন শান্ত স্থিত হতে শেখা। দর্ভকদের পথ ভক্তির, তার মধ্যে না আছে নিয়ম শৃঙ্খলা, না কর্মমুখরতা। সেই পথও খণ্ডিত। অচলায়তনিকদের মত শোনপাংশুরা বা দর্ভকরা কেউই 'গুরু'র প্রকৃত স্বরূপকে বুঝতে পারেনি।

আচার্য অচলায়তনের নিয়মের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলে রাজা মন্থর গুপ্ত আর মহাপঞ্চকের ষড়যন্ত্রে তাঁকে অন্ত্যজ দর্ভকপাড়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়। পঞ্চককেও এখানে নির্বাসিত করা হয়। পঞ্চক আগেই শোনপাংশুদের কাছ থেকে নৃত্য শিখেছিল, এবার দর্ভকদের থেকে শিখল গান। পঞ্চকের মধ্যে বিদ্যা, নৃত্য ও গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম হল। আচার্য আর পঞ্চককে বিদায় দিয়েও অচলায়তনের সমস্যা মিটল কই? বরং সেখানে চারিদিকে আলো আর ছুটির বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে, শুধু গুরুর আমারই প্রতীক্ষা...।

৪

শোনপাংশুদের সঙ্গী করে দাদাঠাকুর যোদ্ধৃবেশে অচলায়তনে প্রবেশ করেন। অচলায়তনকে ধূলিস্যাৎ করে তিনি ম্লেচ্ছ অস্পৃশ্য দর্ভকপাড়ায় আসেন। দাদাঠাকুররূপী গুরুকে শব্দ আর রূপের আলোয় মন্দিরের শঙ্খবাদক আর মালঞ্চের মালি ঠিক চিনে নেয়। আচার্যও চিনে নেন। অভ্যাসের চক্রের গন্তব্যহীন আত্মপ্রদক্ষিণ থেকে সোজা রাস্তার বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যই গুরু আসেন। আচার্যকে তিনি সঙ্গী করে নেন। পঞ্চককে অচলায়তনের আচার্যের পদে বসান। তাকে অচলায়তনের 'কারগার' অপসারিত করে সেখানে 'মন্দির' গেঁথে তুলতে হবে। 'আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে' ওঠার, 'ক্ষুধাতৃষ্ণা-লোভভয়-জীবনমৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে অপনাকে প্রকাশ করার রহস্য' মহাপঞ্চক জানে। গুরু এই ভ্রান্তবুদ্ধি বীরকেও নতুন অচলায়তনের সৃষ্টিকার্যে বৃত করেছেন। কর্মচঞ্চল শোনপাংশুদের আত্মসংযমের শিক্ষা সেই দেবে। পঞ্চকের এই জয়যাত্রায় সে সুভদ্রকে সঙ্গী করে নিয়েছে। তারা কেবলি অচলায়তনের চারদিকের সমস্ত জানলা-দরজা খুলে বেড়াবে। অচলায়তন ভাঙার কাজে স্থবিরদের সঙ্গে শোনপাংশুদের রক্ত মিশেছে। এবার আর রক্তপাত নয়, 'নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে' দাঁড় করানোর প্রেরণা জেগেছে পঞ্চকদের প্রাণে। ভারতবর্ষের মিলনমূলক ঐক্যই শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন,

> "...নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালোবাসিবে সেই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর।...আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে। যত লড়াই ঐ শাস্তির সঙ্গে? আর, যত মমতা ঐ পাপের প্রতি?...আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত দেশ ব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায়

নাই। ...অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে।" (আর্য্যাবর্ত্ত, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮)।

আচার্য রবীন্দ্রনাথ মুক্ত শিক্ষার উদার পরিবেশ তৈরি করার ভাবনাকে সাকার রূপ দিতে চাইলেন 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। তিনি মানুষের সর্বাঙ্গীন শিক্ষা বিকাশের লক্ষ্যে তপোবনের শিক্ষাভাবনাকে বর্জন করলেন না, সংস্কার করে যুগোপযোগী করে নিলেন। তার ভাবনায়

> "তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীতে খুব একটি বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে সঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না।" (৪ ভাদ্র, ১৩২৯, বিশ্বভারতী)।

তাঁর এই 'আদর্শায়িত শিক্ষালাভ করে শিক্ষার্থী 'রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদয় শতদলপদ্মের মতো বিকশিত' করে তুলতে পারবে, সর্বোপরি 'মানুষ হবে'। (২০ ফাল্গুন, ১৩২৮, বিশ্বভারতী)। বিশ্বভারতীকে তিনি 'ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র' করতে চেয়েছিলেন। (মাঘ, ১৩২৮, বিশ্বভারতী)। 'মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য' (৯ পৌষ ১৩৩৯, বিশ্বভারতী), তাই 'বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগলাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনে পূর্ণতা-সাধন' (১৮ আষাঢ়, ১৩২৬, বিশ্বভারতী)। তাই ভারতবর্ষের চিরাচরিত ঐতিহ্যের মধ্যেই সমকালের চিন্তার মিলনে তৈরি করতে চেয়েছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তার স্বপ্নলব্ধ শিক্ষাকেন্দ্র এইরকম,

> "ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।" (বৈশাখ, ১৩২৬, বিশ্বভারতী)।

ব্রহ্মবিদ্যালয়, আশ্রমবিদ্যালয়ের পর বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সংস্কারের যাত্রাপথ। (২২ ডিসেম্বর ১৯২১-এ বিশ্বভারতী)' সর্বসাধারণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়। নিয়মসর্বস্বতার অচলায়তনের আগল টুটল, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের (দর্ভকদের ভক্তি) স্থানে এল 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' বিশ্বভারতী (স্থবিরদের উন্মুক্ত জ্ঞান)। এই মেলবন্ধন ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২-এ শ্রীনিকেতনে Rural Reconstructon বা পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সার্থক হয়ে উঠল, শোনপাংশুদের কর্মমুখরতাও স্বীকৃত হল। নিয়মনিষ্ঠা আর নিয়মভাঙার সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ যে 'সব পেয়েছির দেশ' গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, 'বিশ্বভারতী' সেই স্বপ্নসম্ভব 'অচলায়তন'!